মনে তীব্র ঘৃনা
(মুক্তিযুদ্ধের গল্প)

এক

মহা আতঙ্কে কাটে তাদের প্রতিটি মুহূর্ত। রাতে শান্তিমত ঘুমাতে পারেনা। দিনটাও কাটে যেমন তেমন। কেউ ঘুমায় আর কেউ জেগে থাকে। আক্রমনের শিকার অনেকেই। কখনো গর্জন শোনা যায়, কখনো মাটি কাঁপানো পথচলা পায়ের আওয়াজ, কখনো আর্তনাদ, কখনো বাঁচার প্রার্থনা- বাঁচাও বাঁচাও চিৎকার। কে কাকে বাঁচাবে ? ওরা হিংস্র। বাঁচাও বাঁচাও চিৎকার করলেও ওরা বাঁচতে দেয় না। ওরা শিকার ধরে ছেড়ে দেওয়ার জন্যে নয়, ওরা নরম মাংশাসী প্রিয়। অপেক্ষাকৃত কঠোর পেলেও ছাড়ে না, মেরে ফেলে। ওরা হিংস্র জানোয়ার। হায়না বেশে ডুকে পড়েছে গ্রামে। একদম অজোপাড়াগাঁয়ে। কাউকে ছাড়ে না। ওরা নিরিহদের উপর অত্যাচার করে আর যারা প্রতিরোধ করতে চায় তাদের অনুসন্ধিৎসু রক্তবর্ন চোখে নিশানা লাগায়। পথঘাট তারা চেনে না, চেনার কথাও নয়। কিছুসংখ্যক দেশীয় হায়না ওদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়। ওরাই কস্তরীর সন্ধান দেয়। তাই তাদের হাত থেকে কেউই বাঁচতে পারে না। কথিত সেই মনুষ্যরুপী হায়নার দুর্গন্ধ যখন বাতাসে মিশে নাশারন্ধ্রে প্রবেশ করে ঠিক তখনই ছুটে পালায় কিশোর কিশোরী, যুবক-যুবতী। সত্য মিথ্যা যাচাই করার সুযোগ নেওয়ার প্রয়োজন মনে করে না। তেমনি এক পরিস্থিতিতে দুর্গাপুর গ্রামবাসী পাক হায়না আসার সংবাদ শুনে যারপরনাই ছুটে পালায় যে যেখানে পারে। পেয়ারা, কুলসুম, মেহেরিন আর সমিরনের মত দশ বারো বছরের কিশোরীরাও বৌছি খেলা ফেলে রেখে ছুটে পালায় অন্য সবার মত। ওরা হায়নাদের বর্বরতার কথা শুনেছে। কিন্তু চোখে দেখেনি। দেখতেও চায়নি। ওদের দেখা মানে চোখ ঝলসে যাওয়া, ওদের দেখা মানে ধারালো নখের হিংস্র থাবায় আক্রান্ত হওয়া, নিজের অস্তিত্বকে বিপন্ন করা।

একদিন সেই পাক হায়নাদের আগমন সন্নিকটে শুনে সমিরনেরা দৌঁড়ে পালিয়েছিল পাটক্ষেতে। তখন পাটের ভরা মৌসুম। বাড়ীর চারদিকে পাটক্ষেত ছিল। বড় বড় পাট। ভেতরে প্রবেশ করে উবুত হয়ে চুপচাপ সুয়ে থাকলে বাহির থেকে দেখা যায় না। ক্ষেতের অভ্যন্তরে উঁকি মারার ঝুঁকি সেই হায়নার দল ভয়ে নিতো না। যদি মুক্তিযোদ্ধারা ওঁৎ পেতে থাকে, অথবা কেউ যদি অতর্কিতে আক্রমন করে সেই ভয়ে তারা নিরাপদ দুরত্ব বজায় রেখে রাস্তা দিয়ে চলাচল করতো। কারণ অকস্মাৎ আক্রমন হলে তারা ছুটে পালানোর পথ খুঁজে পাবে না। আর যদি কোন কারণে পাট গাছ নড়ে ওঠে তাহলে গুলি করলেও শুয়ে থাকা মানবের গায়ে স্পর্শ করবে না। সেই বিশ্বাসে ওরা সুয়ে ছিল। সুয়ে সুয়ে বেঁজির মত সুযোগ মত উঁকি মেরে দেখছিল যে, হায়নার দল কোন দিক থেকে আসে আর কোন দিকে যায়।

হঠাৎ সমিরন চমকে উঠল। কিসের একটা আওয়াজ শুনতে পেল। খরগোশের মত কান খাড়া করে সেই আওয়াজ বোধ করার চেষ্টা করল। তবে আওয়াজটা মানুষের পায়ের আওয়াজের মত ছিল না। অন্য কোন অপশক্তি হতে পারে। সমিরণ ভয়ে সংকুচিত হয়ে গেল। আশেপাশে তাকানোর মত সাহস সে হারিয়ে ফেলেছে। সঙ্গে যারা পালিয়ে ছিল তারা কেউ এক জায়গায় ছিল না। বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্তভাবে ক্ষেতের মাঝে পালিয়ে ছিল। অভয় দেওয়ার মত কেউ তার কাছাকাছি ছিল না। পনের বিশ হাত দুরে যারা ছিল তাদের কাউকে ডাক দেওয়ার মত শব্দ তখন তার গলা দিয়ে বের হয়নি। আতঙ্কে চোখ বন্ধ হয়ে গেল। সমস্ত শরীর অবশ হয়ে গেল। নড়ার মত ক্ষমতাও সে হারিয়ে ফেলেছিল। তবুও চোখখুলে ধীরে ধীরে তাকাল। কেউ নেই ধারে কাছে। মানুষের অস্তিত্ব বলতে তারা কয়জন, যারা একত্রে ছুটে এসে পালিয়েছে। তাও কিঞ্চিত জামা কাপড় দেখা যায়। কিছুই যখন নেই তখন কিছু একটা হয়ত পড়েছে

মনে করে প্রসন্ন হল। মাটির সাথে মাথা ঠেকিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস নিল। তারপর মাথাটা তুলে বাম পাশে তাকাল। বাম পাশ থেকেই শব্দটা এসেছিল। রক্তরাঙা কিছু একটা সমীরনের নজরে পড়ল। ঠিক বুঝতে পারেনি সেটা কি। তবে ঐ স্থান থেকে মনে হয়েছিল শেয়ালের খামছি খাওয়া পাখির মৃতদেহের মত। রক্তভেজা ছিল বিধায় তাতে পাটগাছের শুকনো পাতা লেগেছিল। সমিরন উপরের দিকে তাকিয়ে দেখল। উপরে কোন বড় গাছ নেই যেখান থেকে পড়তে পারে। বিলজুড়ে খোলা পাটক্ষেত। ততক্ষনে তার বুকের ধড়ফড়ানি কিছুটা কমে গেল। কোন শব্দ করেনি, কাউকে ডাকেওনি। সে খুব সাহস করে আস্তে আস্তে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গেল। গিয়ে দেখে সেটা কোন পাখির মৃতদেহ নয়। একখন্ড রক্তমাখা মাংশপিন্ড। সে পুনরায় ডানে বায়ে তাকাল। কিছুই দেখতে পায়নি।
তারপর ছোট একটা পাটকাঠি ভেঙ্গে মাংশপিন্ড নেড়ে দেখল। কিন্তু একি ! এটা কোথায় থেকে এলো, কিভাবে এলো ? সমিরন চমকে উঠল। তার গা ছমছম করে উঠল। সমস্ত শরীর নিথর হয়ে পড়ল। তার দুচোখ দিয়ে ঝরঝর করে পানি গড়িয়ে পড়ল। হায় আল্লাহ, কার না জানি সর্বনাশ হল ! হে আল্লাহ, তুমি ওদের বিচার করো। সমিরন উপরে হাত তুলে খোদার কাছে বিচার চাইল।
এমন সময় সমিরনের কানে বেজে উঠল শিশুর কান্না। সমিরন কান্না থামিয়ে স্থির হয়ে অবস্থান করে কান খাড়া করে দিল। বেশী দুরে নয় নিকটে কোন শিশু কান্না করছিল। সমিরন উঠে বসল। আশেপাশে দৃষ্টিপাত করল। কাউকে দেখা যায়নি। কান্নার আওয়াজ শুনে শুনে সমিরন শতর্কতার সহিত আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল।
ভয়ার্ত চিৎকার দিয়ে উঠল সমিরন। অন্যরা ভেবেছিল সমিরন হয়ত হায়নার আক্রমনের শিকার হয়েছে। তারা যার যার অবস্থানে থেকে আতঙ্কিত হয়ে খোদার কাছে প্রার্থনা করছিল। কান্না করার মত আবেগ তাদের ছিল না। মনে শুধু আতঙ্কই কাজ করছিল। এমতাবস্থায় সমিরন ওদের নাম ধরে ডাকল- কুলসুম, মেহেরিন, পেয়ারা তোরা জলদি আয়।
ওরা ভয়ে নির্ভয়ে সমিরনের ডাকে সাড়া দিয়ে এগিয়ে গেল। হায়নার বর্বরতার শিকার হয়ে পড়ে আছে কেউ একজন। জীবিত না মৃত ওরা তা জানে না। জানার মত বয়স বা অনুমান করার মত ক্ষমতা তখনও তাদের হয়নি। একটি ছোট্ট শিশু পাশে বসে কাঁদছে। ক্ষুধার চোটে মায়ের বুকের উপর উঠে, দুগ্ধ খুঁজে পায় না। ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত হয়ে পড়ে আছে অপরিচিত এক মায়ের দেহ। শিশুটি মাতৃদুগ্ধ পান করতে গিয়ে খুঁজে না পেয়ে হাত মেলে দেখে। তার রাঙা হাত। মায়ের রক্তে ভেজা তার কচি দু'হাত। বর্বরেরা তাকে মাতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত করেছে। মাতৃদুগ্ধের পরিবর্তে তাকে দিয়েছে রক্ত, তাও তার মায়ের পবিত্র রক্ত। সে হাত মেলে তাকিয়ে দেখে, মুখে লাগায়, চুমু খায়, চোখ মুছে। একবার মুঠ করে আবার মেলে ধরে, আর কাঁদে। অতঃপর মায়ের সাড়া না পেয়ে পাশে বসে মায়ের নাকে মুকে খামছি মেরে মুখের উপর মাথা ঠেকিয়ে কাঁদে।
পাকসেনাদের দোসর রাজাকার, আলবদর, আল-সামস ওরা এতো ভয়ঙ্কর ছিল যে, হিংস্র জানোয়ার হায়নার চেয়েও ভয়ঙ্কর বলা যায়। মানুষের দেহটাকে ছিঁড়ে নেওয়ার মত কিছু বৈশিষ্ট্য প্রকৃত জানোয়াররুপী হায়নাদের মাঝে থাকলেও মনুষ্যরুপী হায়নাদের মাঝে ছিল না। মনুষ্যরুপী হায়নারা শিশুটিকে চিরদিনের জন্য তার মায়ের স্নেহ থেকে বঞ্চিত করেছে। মাতৃদুগ্ধ থেকে বঞ্চিত করেছে। শুধু বঞ্চিতই নয়, পাশবিক অত্যাচার করতঃ ইজ্জত লুণ্ঠন করে, ধারালো নখের হিংস্র আঁচড়ে জর্জরিত করে প্রস্থান করার সময় স্তন কেটে ফুটবলের মত কিক্ মেরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গেছে। এরপরও একজন মানুষ বেঁচে থাকতে পারেনা। সমিরন যুদ্ধকালীন সময়ে সেই হায়নাদের স্বচক্ষে দেখেনি, তবে তাদের অত্যাচারের নমুনা এভাবেই দেখেছে। তার ভাষায় হানাদার ও তাদের দোসররা কোন মানব সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্ত হতে পারেনা, তারা হয়ত কোন জন্তু জানোয়ারের প্রতিচ্ছবি কিংবা বংশধর হবে।

দুই.

অতটুকুন শিশুটিকে বারো বছরের সমিরন কোলে তুলে নিল। সঙ্গীরা মিলেজুলে তাকে লালন পালন করতে লাগল। তাদের পরিবার থেকে কোন বাধা নিষেধ পড়েনি, বরং সকলেই সহযোগিতা করেছিল। একসময় দেশ স্বাধীন হল। সমিরনের বিয়ে হল। কিন্তু ছেলেটিকে সে কোল থেকে নামায়নি। বিয়ের প্রথম শর্তই ছিল সে ছেলেটিকে সাথে রাখবে। শশুর পক্ষ সুন্দরভাবেই তা মেনে নিয়েছিল। ছেলেটি মাতৃস্নেহে বড় হতে লাগল। নাম রেখেছিল সুরুজ। সমিরণের ইচ্ছে ছিল তাকে মাদ্রাসা লাইনে পড়াবে, বিরাট বড় আলেম বানাবে এবং সেই উদ্দেশ্য সামনে রেখে সমীরনের স্বামী আক্কাস মিয়া তাকে নিজেদের পরিচয়ে মাদ্রাসায় (এতিমখানা সংযুক্ত) ভর্তি করে দিল। থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা হোষ্টেলেই করে ছিল। সে প্রত্যহ টুপি পাঞ্জাবী পরে মাদ্রাসায় যায়, পড়াশুনা করে। মেধাও বেশ ভাল, তবে স্বভাবটা একটু ডানপিঠে ধরনের হয়েছিল। এমনি ভাবে যেতে যেতে সে হাইস্কুল লেবেলে উঠল। ক্লাস সেভেনে (মাদ্রাসা লাইনে) থাকাকালীন সময়ে সে একবার মাদ্রাসা ত্যাগ করে পালিয়ে এলো। সেখানে হুজুরেরা তাকে প্রচন্ড মারদোর করে বলে জানাল। মারদোর করার কোন কারণ সে না বললেও তার দুষ্টোমী এর জন্যে অনেকাংশে দায়ী বলে সহপাঠীরা জানাল। পরবর্তীতে সন্ধ্যান নিয়ে জানা গেল যে, লঘু দোষের কারণেও তাদেরকে কঠিন শাস্তি দেওয়া হয়। আড়ার সাথে হাত বেঁধে উঁচু করে তুলে চোরের মত পেটানো হয়। কিংবা মোরগচেঙ্গী দিয়ে পশ্চাৎদেশে প্রহার করা হয়। কেউ মাদ্রাসা থেকে পালিয়ে গেলে তাকে ধরে এনে পায়ে শিকল দিয়ে বেড়ী বেঁধে মোটা কাঠের গুঁড়ি ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। এসব কারণেই সে পালিয়ে গিয়েছিল।

পাড়া প্রতিবেশী শুভাকাঙ্খীরা তাকে কখনোই কুঁড়িয়ে পাওয়া ছেলে হিসাবে অবহেলা করেনি, বরং মানুষের মত মানুষ হিসাবে বেঁচে থাকার জন্য প্রেরণা দিয়েছে। কেউ কখনো বুঝতে দেয়নি তার আসল পরিচয়। সে সমিরনকে মা হিসাবে জানে এবং আক্কাস মিয়াকে বাবা হিসাবেই জানে এবং সেভাবেই বেড়ে উঠেছে। ফলে সকলের পরামর্শ ও স্নেহের আদলে সে পুনরায় মাদ্রাসায় গেল। আক্কাস মিয়া স্বয়ং গিয়ে ক্ষমা চেয়ে অনুরোধ জানিয়ে সেই বারের মত শিক্ষকদের কাছে হোষ্টেলে রেখে এলো। শিক্ষকেরা তাকে ছাড় দেয়নি। আক্কাস মিয়া ফিরে আসার পর পরই তাকে প্রচন্ড রকমের প্রহার করল। চোরদেরকে যেভাবে থানায় মোটা বেত দিয়ে প্রহার করা হয় এবং প্রহারের পরে তাদের থ্যাকথ্যাকে রক্তাক্ত চামড়া দেখলে যেমন শরীর শিয়রে ওঠে ঠিক তেমন নির্মম ভাবেই তাকে প্রহার করা হয়েছিল। সুরুজ পুনরায় পালিয়ে এলো।

তার পালিয়ে আসাকে আক্কাস মিয়া সহজভাবে গ্রহন করতে পারেনি। পরে সে যখন পিঠের কাপড় উঠিয়ে দেখাল তখন আক্কাস মিয়ার রাগ কমে বরফ হয়ে গেল। মারের দৃশ্য দেখে তার মাথায় রক্ত উঠে গেল। কথিত সেই হুজুরের উপর চড়াও হল। অবশেষে এলাকার গন্যমান্যদের হস্তক্ষেপে সেই হুজুর সেইবারের মত রেহাই পেল এবং সুরুজকে পুনরায় মাদ্রাসায় দেয়া হল। এমনিভাবে চড়াই উৎরাই পেরিয়ে সুরুজ দাখেল পাস করল।

দাখেল পাস করার পর সে আর মাদ্রাসায় যেতে রাজী হয়নি। ঘৃনা প্রকাশ করল মাদ্রাসার নিয়ম কানুনের প্রতি। মাদ্রাসায় নাকি বাধ্যগত শিবিরকর্মী হতে হয়। শিবির সমর্থন না করলে এবং যদি তা প্রকাশ পেয়ে যায় তাহলে অত্যাচার সইতে হয়। তার ভাষায় হুজুরেরা অত্যন্ত নির্দয় ও নির্মম। তারা নিজেদেরকে বিরাট কিছু মনে করে। নিজেদেরকে শক্তিশালী ও ক্ষমতাশালী মনে করে। নিজেদেরকে বেহেস্তের একমাত্র দাবীদার মনে করে, বেহেস্তের মালিক মনে করে (নাউজুবিল্লাহ)। সেই অহংকারে অহংকারী তারা। ব্যক্তি অধিকার হরণ করে মনগড়া ফতোয়া দেয়। কোন কারণে মতের অমিল হলে অশ্রাব্য ভাষাও ব্যবহার করে। তারা একবার প্রহার শুরু করলে থামতে চায় না, যতক্ষন না প্রাণপ্রদীপ নিভে যায়। কেউ নামাজ না পড়লে তার সাথে সম্পর্ক না রাখার পরামর্শ দেয়, কথা না বলার পরামর্শ দেয়। অথচ সৎব্যবহার দিয়ে মানুষকে সৎপথে আনার পরামর্শ দিয়েছে ইসলাম। যাকে তাকে কাফের বলতেও দ্বিধা করে না। অথচ একজন মুসলমান হয়ে আরেকজন মুসলমান সন্তানকে কাফের বলা যাবে না বলে কোরাণ-হাদিসে নির্দেশ রয়েছে। তাদের মাঝে এমন একটা শক্তি কাজ করে, যার ফলে তারা মনে করে

যে 'আল্লাহু আকবার' বলে মানুষকে আঘাত করলে পুন্য হবে, কিংবা নিজে মারা গেলেই শহীদ হবে এবং বেহেস্তে চলে যাবে। বেহেস্ত পাওয়া কি এত সস্তা ? ছাত্র শিবির কিংবা জামাতশিশির বাদে বাকী সবাইকে তারা বিরোধী শক্তি হিসাবে মনে করে। ইত্যাকার নানান কর্মকান্ডের ফলে সে মাদ্রাসায় পড়তে রাজী নয়। সে নামাজ রোজা করে রীতিমত। তবে মাথায় টুপি পরে না। তার ভাষায়- মাথায় টুপি না পরলেও নামাজ হয়। নামাজের কোন ক্ষতি হয় না। টুপি, পাজামা, পাঞ্জাবী ছাড়াও এবাদত করা যায়। সমিরনের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও সে দাঁড়ি রাখেনি। অনীহা প্রকাশ করল। ঐ লেবাসের প্রতি তার ঘৃনা সৃষ্টি হল আপনা থেকেই। সে স্বাধীনতার বিরোধী শক্তি হিসাবেও ঐ লেবাসকে ঘৃনা করে। তার এই তীব্র ঘৃনা সবাইকে অবাক করেছে। অথচ সে তার জন্মপরিচয় ও তার মায়ের মৃত্যুর কাহিনী কখনো জানতেও পারেনি।

***

আইয়ুব আহমেদ দুলাল তাং ১৪.১২.০৮ইং
সৌদি আরব।
উ-সধরষ:- ধুঁনধযসবফফ@মসধরষ.পড়স